Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 216 – 225
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে-বাইরে' : মেয়েদের অবস্থান

ড. মধুমিতা আচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত), রাঘবপুর ক্যাম্পাস, কলকাতা
Email ID : macharya1973@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Twentieth century, Revolution, Bengal Renesys, Swadeshi movement, Women's position, Inner-hall, Outer space, Women's education, Conflict.

Abstract

Rabindranath Tagore's novel Ghare-Baire was published in sobujpotro from Baishakh to Phalgun in Bangabda 1322. In Bangabda 1323 Ghare-Baire was first published. Rabindranath Tagore wrote his Novel Garhe-Baire against the background of the Swadeshi movement of Bengal. In this novel the real position of women of that era is revealed in the context of the story of Bimala. Bimala is a bride of a Zamindar family, her husband is a highly educated liberal man. Nikhilesh, husband of Bimala, is a character who is ahead of his time, totally different from the stereotype patriarchal social system of that era. He wants to get Bimala not only in the small confines of the house but also in the larger world - outside the house.

In the novel Ghare-Baire we will also see the two wives, Nikhilesh's brother's wives, who are forced to accept widowhood due to their husband's promiscuity and perversity. This is their fate as brides of the Zamindar family. The two wives of the husband's brother of Bimala are living their lives of endless pain in two different paths.

Towards the end of 19th Century women started to nurture their desire for emancipation, and the right of education. This indomitable desire started to flourish in the beginning of the 20th century. The bonds of social customs accumulated in their blood for ages were pulling them back. The booming part of the 19th Century is the very beginning of the 20th century. That's why just as Bimala feels attracted to Nikhilesh's advice to go out and runs madly at Sandeep's charms, from that point also her inner conscience of chastity starts to haunt her terribly in self-torture.

Rabindranath Tagore wrote this novel to enlightening the position of women in early twentieth century, when the maximum numbers of women are not allowed to go for education. Specially the married women are confined in their in-law's house. In this age Nikhilesh, Bimala and Sandeep are created in a different way.

Discussion

বাংলার স্বাদেশিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন তাঁর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। এই উপন্যাসে বিমলা ও তার দুই জায়ের কথা প্রসঙ্গে ফুটে উঠেছে সে যুগের মেয়েদের প্রকৃত অবস্থানের চিত্র। বিমলা জমিদার পরিবারের বধূ, তার স্বামী উচ্চশিক্ষিত উদারমনা মানুষ। নিখিলেশ সে যুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে কালের চেয়ে এগিয়ে থাকা এক চরিত্র। সে বিমলাকে পেতে চেয়েছে শুধু ঘরের মধ্যের ক্ষুদ্র সীমায় নয় - ঘরের বাইরে বৃহত্তর জগতেও। এই বাইরে বেরোনোর প্রশ্নে বিমলার দ্বিধা, সেই দ্বিধাকে অতিক্রম করার চেষ্টা, বাইরে বেরোনোর পর হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় বিমলার তাৎক্ষণিক বিপর্যস্ত অবস্থা এবং বিমলা বাইরে বেরনোয় পরিবারের অন্য নারীদের মনে তার প্রতিক্রিয়া - সবই বড় যত্নে রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরে-বাইরে* উপন্যাস প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাগুন পর্যন্ত। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় *ঘরে-বাইরে*।

'রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' গ্রন্থে শ্রীভূদেব চৌধুরী বলেছেন–

> "নানা দিক থেকেই 'ঘরে বাইরে'র প্রেক্ষাপট তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্র-উপন্যাসে এখানেই সর্বপ্রথম গল্পকাল বিশ শতকের চৌহদ্দিতে পূর্ণ প্রবেশ করেছে; আর তার স্বাতন্ত্র্যও যে অভূতপূর্ব, উপন্যাসের ভেতরে - বাইরে সে ঘোষণা স্পষ্টোচ্চারিত।"[১]

বিশ শতকের খোলা হাওয়া বইবার জন্য প্রদীপের সলতে পাকানোর মতো করেই আসে উনিশ শতকের কথা। উনিশ শতকে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বাংলায় নবজাগরণ ঘটেছিল। একদিকে রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে, সমাজে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কল্পে আন্দোলন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই। লর্ড ডালহৌসী এই আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং আইন প্রবর্তিত হয় লর্ড ক্যানিং এর সময়। সতীদাহ প্রথা নির্মূল হলেও সমাজ খোলা মনে বিধবা বিবাহকে মেনে নেয় নি, তাই সমাজের অগ্রণী অংশ বিধবার দুঃখ দূর করতে তার বিবাহ দিতে এগিয়ে এলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সতীদাহ রদ এবং বিধবা বিবাহ না বাড়ায় সমাজে 'বল্লালী-বালাই'দের[২] সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাব বিমলার দুই বিধবা জাকে, তাঁরা জমিদার পরিবারের বধূ হিসাবে স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য বৈধব্যকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। বিমলার দুই জা দুই ভিন্ন পথে তাঁদের অন্তহীন বেদনার জীবন যাপন করছেন, একজন জপতপ, ঠাকুর দেবতা নিয়ে ভুলে আছেন, অন্যজন নিজে বঞ্চিত থেকেও রসের কথায়, রসের ইঙ্গিতে মন মজিয়ে রেখেছেন। এই রসের অতিরেক তাঁর নিজের জীবনে কতখানি নির্মম অন্তঃসারশূন্য, তা নিজেও জানেন বলেই তা এতখানি মর্মান্তিক।

উনিশ শতকীয় সমাজে নারী মুক্তির বাসনা, নারীর বাইরে বেরোনোর আগ্রহ, শিক্ষার অধিকার বিশ শতকের সূচনায় নারীকে যেমন দিয়েছিল বাইরে বেরোনোর মুক্তির ডাক ঠিক একইভাবে তার রক্তের মধ্যে যুগ যুগান্ত সঞ্চিত হওয়া সংস্কারের বন্ধন তাদের পিছন দিকে টেনে ছিল। উনিশ শতকেরই উছলে পড়া অংশ বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক। সেই কারণেই বিমলা যেমন একদিকে আকর্ষণ অনুভব করেছে নিখিলেশের পরামর্শে বাইরে বেরোনোর এবং সন্দীপের আকর্ষণে উন্মত্তবৎ ছুটে গেছে তেমনি তার অন্তঃগূঢ় সতীত্বের সংস্কার নিখিলেশের জীবনে বড় ধরনের আঘাত আসার সম্ভাবনায় তাকে ভয়ংকর ভাবে আত্মপীড়নে এবং অনুতাপে দগ্ধ করেছে। জীবনের পরতে পরতে মিশে থাকা সংস্কার, রক্তের মধ্যে বয়ে চলা বহু যুগ লালিত পিছুটান তাকে ভাবতে বাধ্য করেছে তার জন্যই নিখিলেশের এই পরিণতি। ভূদেব চৌধুরী তাঁর *রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন –

> "একেবারে প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতে বিমালার অপরূপ কবিতাকল্লোলিত মাতৃস্মৃতিচারণ এবং আত্মধিক্কার কখনকার ঘটনা? সন্দীপ এবং নিখিলেশের 'আত্মকথা' ঘটনাবার্তিত ব্যক্তিত্বের অব্যবহিত আত্ম-উন্মোচন। বিমলার 'আত্মকথা'ও তাই; কেবল ঐ প্রারম্ভিক অংশটি অতীতচারণের রোমন্থনে মন্থর – দিদিশাশুড়ির কাল হতে হালের কালে উত্তরণের পথের দিশেটি।"[৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 216-225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাসের একেবারে শুরুতে 'বিমলার আত্মকথা' অংশে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছেন স্বগত ভাষণে নারীর একান্ত নিজস্ব চাওয়া-পাওয়ার ভাবনাকে। রূপ সম্পর্কে, সতীত্ব সম্পর্কে, স্বামী সম্পর্কে - কুমারী ও নব বিবাহিতার মনের নিজস্ব ধারণাকেই এই অংশে রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিমলার আত্মকথনের সূচনা হয় তার মায়ের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে। মায়ের সতীত্বের পুণ্যরূপ বিমলার চোখে গাঁথা ছিল।

> "মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লালপেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ – শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো।"[৪]

বাঙালি মেয়েদের মন, যা গড়ে উঠত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষায়; যেখানে সতীত্বের আদর্শ ছিল নারীর জীবনের চেয়েও অধিক মূল্যবান। সেই সামাজিক শিক্ষার আদর্শ নিয়েই বিমলার জীবনপথে যাত্রা শুরু হয়েছিল। সুন্দরী তো সে নয়, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পায়, দেবতার কাছে এক মনে এই বর চেয়েছিল বিমলা। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় তার শ্বশুরবাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে তার হাত দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা, এ সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে,

> "তা হবেই তো, বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে।"[৫]

পুরুষ শাসিত সমাজ এভাবেই মেয়েদের মনকে তৈরি করে দিয়েছে - যেখানে সতীত্বের আদর্শই চূড়ান্ত। মেয়েদের নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাললাগা - মন্দলাগা সেখানে নিতান্ত বাহুল্য। সে পুরুষের জন্য সৃষ্ট - একান্ত বালিকা বয়সে পুরোহিত, দৈবজ্ঞ প্রমুখের চেষ্টায়, উদ্যোগে যাকে সে স্বামী বলে পেল, তাকে ঘিরেই তার বেড়ে ওঠা - আজীবন তাকেই ভালোবেসে যাবার জন্য তার বেঁচে থাকা। সেখানে মেয়েদের নিজের মনের কোন দাম নেই। এভাবেই বাঙালি নারীর জীবন কেটেছে সেকালে। বিমলাও এই সতীত্বের আদর্শকে পাথেয় করেই স্বামীর ঘর করতে এসেছে।

সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ দেখতে শ্যামলা মেয়েটির বিয়ে হল রাজার ঘরে। রাজপুত্র সম্পর্কে মনের মধ্যে যে ছবি ছিল, সে ছবির সঙ্গে নিখিলেশের রূপের কিন্তু সে মিল খুঁজে পেল না। তবুও ভালোবাসা এলো - এল ওই সতীত্বের আদর্শ চিন্তার পথ ধরেই। ভোরবেলায় উঠে যখন সে অতি সাবধানে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিত, তখন তার মনে হত, তার সিঁথির সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। যে ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়, এ নারীহৃদয়ের সেই পবিত্র ভালবাসা। জীবন পথের এই পাথেয় নিয়েই বিমলার দিন কাটতে পারত। নিখিলেশ তাকে ঘরের বাইরে বের করতে না চাইলে বিমলা হয়তো ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সুখীই হতে পারত, কিন্তু নিখিলেশ ছিল সে যুগের পুরুষদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। সে বিমলাকে পেতে চেয়েছিল বিশ্বসংসারের মুক্তির মাঝে। শুধু স্বামীত্বের অধিকারে ম্যুনিসিপ্যালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দে সে খুশি ছিল না। নিখিলেশ চেয়েছিল বাইরে বেরিয়ে তার বিমল তাকে যোগ্যতম রূপে চিনে নিক – ভালোবাসুক। এ ভালোবাসার দাবি স্বামীত্বের দাবি নয়, বরং প্রেমিকের দাবি।

> "বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল।"[৬]

নিখিলেশের এ ধ্যান-ধারণা বিশ শতকীয়। এই প্রসঙ্গে *রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে* গ্রন্থে শ্রীভূদের চৌধুরী বলেন-

> "*ঘরে-বাইরে*-তে, সর্বপ্রথম হলেও, যে কালের অভিধা পুনঃপুন উচ্চারিত – সে 'মডার্ন'। কালের এ পরিচয় আসলে প্রবাহমান ভাব -চরিত্রের পরিমাপে। তার হিসেব পরে হবে; আপাতত দেখি, "ঘরে-বাইরে"র গল্পকাল 'স্বদেশী'র যুগের – ১৯০৫ থেকে '১১ অবধি যার পরিধি; নিখিলেশের বয়স তখন ছিল তিরিশের ঘরে। অতএব নিখিলেশ - সন্দীপ এরা উনিশ শতকেই যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছিল; এমন কি বিমলার বিয়েও সেই পুরোনো কালেরই ঘটনা – গল্পকালে তার বিবাহিত জীবনের ৯ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাহলেও উপন্যাসের কোথাও উনিশ শতকীয় ভাব ভাবনার হস্তাবলেপ ঘটতে পায়নি; ওই যাকে বলে 'মডার্নিটি' – রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন 'নতুন কাল' সর্বত্রই তার একাধিপত্য।"[৭]

বিমলা তার আত্মকথায় জানিয়েছে –

> "আমার শ্বশুর - পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা-কানুন মোগল-পাঠানের, কতক বিধিবিধান মনু-পরাশরের।"[৮]

এই পরিবারে নিখিলেশ একেবারে খাপছাড়া সৃষ্টি। নিখিলেশের বড় দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন। নিখিলেশ মদ খায় না, তার চরিত্রে অন্য কোন চঞ্চলতাও নেই। নিখিলেশই তাদের পরিবারে প্রথম রীতিমতো এম.এ পড়েছে। বিমলাকেও সে শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট হয়। এই জন্য এক ইংরেজ মহিলা মিস গিলবিকে সে নিযুক্ত করে। বাঙালি জমিদার পরিবারের বধূর শিক্ষার জন্য ইংরেজ মহিলার নিযুক্তিতে ঘরে বাইরে নিন্দার ঝড় ওঠে। এই মিস গিলবির হাত ধরেই বিমলার শিক্ষা চলতে থাকে। নতুন কালের সঙ্গে তার নতুন ভাষায় পরিচয় গড়ে ওঠে।

বিমলার জীবনের দু-কূল ছাপিয়ে নিখিলেশের আদরের বান বইল। সাজ-সজ্জা, দাস-দাসী, জিনিসপত্রের অভাব রইল না। বিমলার দিদিশাশুড়ি বিমলাকে ভালোবেসেছিলেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল বিমলা স্বামীর ভালোবাসা টানতে পেরেছে। তাই আধুনিক ইংরেজি কেতায় নানা পোষাক এনে যখন নিখিলেশ বিমলাকে সাজাতে চেয়েছে তখন পছন্দ না হলেও তিনি তাতে বাধা দেন নি। কারণ তিনি মনে করতেন – "আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর কাউকে সাজাতে যেত।"[৯] এই দিদিশাশুড়িই ছিলেন নিখিলেশ-বিমলার সংসারের কর্ত্রী। নিখিলেশ যে তার দাদাদের মত মদে ডুবে যায়নি এতেই তিনি কৃতার্থ ছিলেন, আর এর সব কৃতিত্বটুকুই বিমলাকে দিয়েছিলেন; তাই বিমলার জন্য যখনই নতুন কোনো কাপড় আসত তিনি তাই নিয়ে নাতিকে ডেকে কত ঠাট্টা - আমোদ করতেন। দেখতে দেখতে একসময় তাঁরও পছন্দের রং ফিরেছিল। কলিযুগের কল্যাণে প্রাচীনপন্থী সংসারের এই কর্ত্রী - ঠাকুরনের শেষে এমন দশা হয়েছিল যে নাত-বউ তাঁকে ইংরেজি বই থেকে গল্প না বললে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না। মেয়েমহলের এই ক্রমশ বদলে যাবার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ বড় যত্নে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর *ঘরে- বাইরে* উপন্যাসে।

বিমলা তার আত্মকথায় জানিয়েছে, তাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু সেটাই নাকি এখানকার নিয়ম। মদের ফেনা আর নটীর নূপুর-নিক্বণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরনীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিমলা এমনই এক পরিবারের বধূ হয়ে এসেছিল, যেখানে এতদিন পর্যন্ত স্বামীদের রাত কাটত বার-মহলে। বিমলার দুই জা এই জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে স্বামীদের মদের নেশা তাদের অকাল বৈধব্যের কারণ হয়েছিল। তাঁদের জীবনে সন্ধ্যা হতে না হতেই ভোগের উৎসব মিটে গেল। কেবল রূপ যৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিথ্যেই জ্বলতে লাগলো। এই পরিবারের বধূ হয়ে স্বামীর আদর টানতে পারা তাই চাট্টিখানি কথা নয়। বিমলার দিদিশাশুড়ি বলতেন, তিনি তাঁর জীবৎকালে তিনবার এই সম্পত্তিকে রিসিভারের হাতে যেতে দেখেছেন। মদ আর মেয়ে মানুষের পিছনে যে পরিবারের পুরুষদের এমনতর টাকা ওড়ানো, সেই পরিবারেরই ছেলে হয়ে কিনা নিখিলেশ এক বিমলায় মুগ্ধ; তাও আবার তার রূপ নেই, অন্তত বর্ণ গৌরব তো নেই-ই। নিখিলেশ বিমলাকে সাজাতে হাল ফ্যাসানের দ্রব্য সামগ্রী এনে জড়ো করলে বিমলা তার জা'দের ঠাট্টা এবং বিদ্রুপের পাত্রী হয়েছে। সে রং বেরঙের শাড়ি, জ্যাকেট, সেমিজ, পেটিকোট পরলে তাঁরা ঈর্ষায় জ্বলতে থাকতেন। তাঁদের ভাবখানা ছিল - রূপ নেই, তার আবার রূপের ঠাট! তাঁরা তাকে এও জিজ্ঞাসা করতেন যে এসব পরতে তার লজ্জা করে না! এই পালা বদলের কাল আসলে রবীন্দ্রনাথের নিজের চোখে দেখা। কালান্তরের 'নারী' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন –

> "বেথুন স্কুলে যে-মেয়েরা সর্বপ্রথম ভর্তি হয়েছিলেন তার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি দ্বারখোলা পালকিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে সেটা অল্প পীড়া দেয় নি। সেই একবস্ত্রের দিনে সেমিজ পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল।"[১০]

যাদের সমালোচনা শুনে বিমলার মনে হত যে মেয়েদের মন বড়ই ছোট, বড়ো বাঁকা; কিন্তু নিখিলেশ বুঝেছিল চীন দেশের মেয়েদের পা-কে যেমন স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে দেওয়া হয় না, চেপে রাখা হয়, এই তার বউদিদিদের মত মেয়েদের মনও তেমনি সমাজ চারিদিক থেকে ঘিরে চেপে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। এমন বাঁকা স্বভাব কিছুতেই তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি হতে পারে না।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে দেখি সে যুগের মেয়ে-মহলের যথার্থ ছবি। বিমলের বড় জা, মেজো জা বিমলাকে ঈর্ষা করতেন। বিমলের বড় জা ছিলেন ভয়ংকর সাত্ত্বিক, তিনি জপে-তপে, ব্রতে-উপবাসে, দিন কাটাতেন। বিমলার মেজো জা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের, তার বয়স ছিল অল্প এবং তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না; বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টায় কিছু পরিমাণ রসের বিকার ছিল। তিনি নিজের জন্য যেসব যুবতী দাসী রেখেছিলেন তাদের রকম-সকম একেবারেই ভালো ছিল না। তিনি তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে নানা রকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। বিমলার মেজো জা মাঝে মাঝে নিজে রেঁধে-বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাকতেন। বিমলার বারে বারে ইচ্ছে হতো তার স্বামী যেন একটা অজুহাত দিয়ে খেতে না যায়। বিমলা রাগ করে একসময় নিখিলেশকে বলেছে তাকে টিটকারি না দিয়ে যদি তাঁদের ইচ্ছা হয় তবে তাঁরাও হাল-ফ্যাশনের শাড়ি, জ্যাকেট পরুন না, লেখাপড়া শিখুন না, মেমের কাছে! নিখিলেশ বিমলকে বুঝিয়েছে হাতে তুলে দিলেও যে তাদের নেবার সাধ্যি নেই, সে যে তাঁদের যুগ যুগান্তরের সংস্কার। আর সেখানেই যে তাঁদের জ্বালা।

বাংলার স্বাদেশিক আন্দোলনে ঠাকুর পরিবারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। নিখিলেশ চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋষি তুল্য চরিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্বদেশ হিতৈষিতায় প্রভূত অর্থ ব্যয় এবং তাঁর নিজের চরিত্রেরও বুঝি মিশ্রণ হয়েছিল। বিমলাকে বাইরে বের করবার চেষ্টায় তাকে শাড়ি, জ্যাকেট, পেটিকোটে সাজিয়ে তোলা - এতেও কোনোভাবে মিশে ছিল রবীন্দ্রনাথের মেজ বউ ঠাকুরান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবী এবং তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর প্রসঙ্গ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী একদা ঠাকুর বাড়ির বউ হয়েও সিভিলিয়নের বউ হিসেবে প্রথম ঘরের বাইরে বেরন এবং তার জন্য উপযুক্ত পোষাকও প্রস্তুত করেন। বস্তুত আজকের বাঙালি নারীর সামনে আঁচল দিয়ে শাড়ি পরবার পদ্ধতিটি তাঁরই আবিষ্কার। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাষ্ট্রে বসবাসকালে মারাঠি মেয়েদের শাড়ি পরার ধরনের সঙ্গে বাঙালিয়ানা মিশিয়ে এর জন্ম। গভর্নর লর্ড লরেন্সের পার্টিতে সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকায় একাই যোগদান করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ঘরের বউকে পার্টিতে উপস্থিত দেখে লজ্জায় সেদিন পার্টি ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের জ্যোতি দাদা তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীকে ময়দানে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় চড়া শেখাতেন। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী বিয়ের পর দু'বছর লোরেটো হাউসে পড়েছেন। ঠাকুর পরিবার যুগের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। বাংলার মেয়েদের অগ্রগতিতে এই পরিবারের বিশেষ অবদান ছিল। সেই পরিবারেরই ছেলের হাতে লেখা উপন্যাসেও তাই আমরা নিখিলেশ-বিমলার মত চরিত্রকে পেলাম, যারা যুগের চেয়ে এগিয়ে আছে। নিখিলেশ সুযোগ দিয়েছে বলেই বিমলা এগোতে পেরেছে। বিমলা সে যুগের বিচারে প্রাগ্রসর নারী।

নিখিলেশ বিমলাকে বহুবার ঘরের বাইরে বার করতে চাইলেও বিমলা তাতে রাজি হয়নি। বিমলা নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপের ফটোগ্রাফ দেখেছিল এবং স্বদেশীর নাম করে তার স্বামীর টাকা যে লোকটা ঠকিয়ে আত্মসাৎ করছে তার জন্য একটা বিরক্তিও ছিল বিমলার সন্দীপের ওপর। এরই মধ্যে নিখিলেশের বাড়িতে যেদিন সন্দীপ বক্তৃতা দিল সেদিন নতুন করে বিমলা সন্দীপকে আবিষ্কার করল, হয়তো বা নিজেকেও আবিষ্কার করল। মেয়ে-মহলে বসে চিকের আড়াল থেকে সে বক্তৃতা শুনছিল - রাজবাড়ির অন্যান্য পুরস্ত্রীর মতই। সন্দীপের বক্তৃতার প্রতি কথায় ছিল ঝড়ের দমকা হাওয়া। কথায় তার সাহসের অন্ত ছিল না। সন্দীপের বক্তৃতা শুনে বিমলার মন দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো।

> "আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলুম আমার মনে পড়ে না।"[১১]

বাইরের পুরুষের সামনে এই প্রথম বিমলার আত্মপ্রকাশ। এক সময় সন্দীপের চোখ তার মুখের ওপর এসে পড়ে, কিন্তু বিমলার তাতে হুঁশ ছিল না। সে কি তখন রাজবাড়ীর বউ? সে তখন মনে-প্রাণে বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি, আর সন্দীপ বাংলাদেশের বীর। বিমলার মনে হয়েছিল তার মুখের দিকে তাকাবার পরই যেন সন্দীপের ভাষার আগুন আরও জ্বলে উঠল, কারণ মেয়েরা তো কেবল লক্ষ্মী নয়, তারাই যে ভারতী। এরপরেই সন্দীপের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বাইরে বেরিয়ে সন্দীপকে নিজে উপস্থিত থেকে খাওয়াতে চেয়েছে বিমলা। বিমলার বাইরে বেরোনো মূলত সন্দীপের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে, কিন্তু স্বামীর কাছে এই আবদারের কথা উত্থাপন করেই বিমলা পিছিয়ে গেছে; বলেছে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 216-225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- নানা সে কাজ নেই। সন্দীপের রংপুরে বক্তৃতা দিতে যাওয়া স্থির হয়ে গেলেও নিখিলেশ তাকে তার স্ত্রী বিমলার ইচ্ছার কথা জানালে সন্দীপ নিখিলেশের বাড়িতে থেকে যায়। বিমলা যখন মাদ্রাজি শাড়ি আর একটুখানি জরিরপার দেওয়া হাত কাটা জ্যাকেট করে সন্দীপের সামনে বেরোনোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন তার মেজো জা ঠোঁট টিপে হেসেছেন, বলেছেন সাজ মন্দ হয়নি তবে বিলিতি দোকানের বুক কাটা জামাটা পড়লেই সাজটা পুরোপুরি হত। এরপর বিমলা সন্দীপকে নিজে উপস্থিত থেকে খাইয়েছে। নিজে ভেতরে গিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়েই আবার সন্দীপের কথায় বাইরের ঘরে এসে সন্দীপ-নিখিলেশের তর্কে সাধ্যমত যোগ দিয়েছে। সন্দীপ তার ব্যবহারের সহজতা দিয়ে বিমলাকে আকর্ষণ করেছে এবং একসময় ঘোষণা করেছে–

> "যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে আগুন বাহিরকে জ্বালায়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা।"[১২]

জন সাধারণের মনোহরণ ব্যবসায় চিরাভ্যস্ত সন্দীপ যখন এইভাবে বিমলাকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তখনই নিখিলেশের মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ বাবু এসে পড়েন। তাঁকে প্রণাম করতে তিনি বিমলাকে আশীর্বাদ করে বলেন ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন। বিমলা তার আত্মকথার প্রথম অংশের শেষে জানিয়েছে যে ঠিক সেই সময়ে তার ঠিক সেই আশীর্বাদেরই প্রয়োজন ছিল।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ তার আত্মকথায় জানিয়েছে সে লোভী নয়, সে প্রেমিক। পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সবচেয়ে বেশি করে খোঁজে সেই জোর হয়তো তার স্বভাবে কম। তবুও অযোগ্যের জন্যই তো বিধাতা ভালোবাসাটুকু এতদিন সঞ্চিত করে রেখেছিলেন।

> "একদিন বিমলকে বলেছিলুম, তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে সে ছিল ঘর গড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি।"[১৩]

বাঁধা বরাতের স্থির ভালোবাসা নিয়ে নিখিলেশ তৃপ্ত ছিল না, সে বিমলাকে পেতে চেয়েছিল মুক্ত রূপে, সত্য রূপে। সরোজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা উপন্যাসের নবনিরীক্ষা' প্রবন্ধে বলেছেন,

> "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত নিখিলেশ সমাজ শৃংখলমুক্ত বিমলার কাছে নিজেকে যাচাই করতে চেয়েছে। স্বভাবতই এই পরীক্ষায় অভিনবত্ব বিদ্যমান।"[১৪]

নিখিলেশ অনুভব করেছে যে তার ভিতরের সংকোচকে মৃদুতা বলে বিমল মনে মনে অশ্রদ্ধা করে, তাই বাইরে বেরিয়ে সে যখন সন্দীপের মধ্যে সেই জোরকে প্রচন্ড রূপে প্রত্যক্ষ করল, স্বাভাবিকভাবেই তার মন ভেসে গেল। সে যুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে নিখিলেশ সুযোগ দিয়েছিল বলেই বিমলা তার নিজের জীবনে এতখানি এগোতে পেরেছে, ঘরের বাইরে আসতে পেরেছে। এরপর থেকে নিখিলেশ ও সন্দীপকে পাশাপাশি রেখে একটা তুলনা করার চেষ্টা বিমলা সবসময় করেছে এবং সন্দীপের সঙ্গে দেশমাতৃকার পূজা পদ্ধতি বা বন্দেমাতরম মন্ত্রকেই একমাত্র পূজার মন্ত্র বলে স্বীকার করার প্রসঙ্গ নিয়ে যখনই তর্ক উপস্থিত হয়েছে, বিমলা মনে করেছে নিখিলেশের চরিত্রে আরেকটু জোর থাকলে ভালো হতো। সন্দীপের বক্তৃতা শোনার আগে পর্যন্ত বিমলার মনে সন্দীপ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবই প্রবল ছিল - প্রথমতঃ লোকটির বাবুয়ানি এবং সে তার স্বামীর অর্থ চুষছে, দ্বিতীয়তঃ লোকটির চেহারা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া, "চোখে আর ঠোঁটে কী একটা আছে যেটা খাঁটি নয়।"[১৫] সন্দীপের সামনে বেরিয়ে তার ক্ষুরধার যুক্তি ও তর্ক করবার ক্ষমতাকে দেখে বিমলা কিন্তু একেবারে ভেসে গেছে। নিখিলেশও অনুভব করেছে ছোট জায়গা থেকে বড় জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তাটা বড়ই ঝোড়ো রাস্তা। তাই ঘরের চতুঃসীমানার যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে তার একান্ত বিমলের জীবন বাসা বেঁধে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ আজ আর তার সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না। এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। যাদের এতদিন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল মনু পরাশরের দোহাই দিয়ে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে, হঠাৎ বাইরে এসে এত আলোয় তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। নিখিলেশের মতো উদারমনা মানুষরা

যাঁরা সে যুগে নারীর বাইরে বেরোনোকে সম্ভব করে তুলেছিলেন, তাঁরা ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র লাভ ক্ষতির হিসেব করেননি বলেই সম্ভব হয়েছিল মেয়েদের প্রথম বাইরে বেরোনো।

এতদিন বিমলা ছিল গ্রামের ছোট নদী। হঠাৎ কোন খবর না দিয়ে সেখানে সমুদ্রের বান ডেকে এল। বিমলা আত্মকথায় বলেছে তার লজ্জা সেদিন কোথায় গিয়েছিল সেটা একটা ভাববার কথা। এর মধ্যে নিখিলেশের মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ বাবু নিখিলেশ বিমলার সংসারের ভাঙন থামাতে তাদের একত্রে দার্জিলিং যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিমলা যেতে চায়নি। বিমলার বড় জা ও মেজজা বৈঠকখানা ও বার মহলের মাঝে ননকু দারোয়ানকে বসিয়ে বিমলাকে সন্দীপের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন। তাতেও লাভ হয়নি। বিমলা দুদিন বৈঠকখানায় না যাবার পর, হঠাৎ সন্দীপের দেশের কাজের জন্য ডাক পেয়ে বৈঠকখানায় যায়, তখন মেজ রানী তাঁর নিজের দাসী থাকোকে টিপে দিয়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া লাগান এবং নালিশ করতে ক্ষেমাকে সোজা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেন। সুপারি কাটার ফাঁকে তিনি বিমলাকে শুনিয়ে গান ধরেন — "রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে"[১৬] এখানে মেজ বউ রানী কিন্তু তাঁর নিজের মতো করে তাঁর ছোট জাকে এক রকম রক্ষা করতেই চেয়েছেন। একদিন তিনি হেসে হেসে বিমলাকে বলেন,

> "আমাদের ছোট রানীর গুণ আছে! অতিথিকে এত যত্ন যে সে আর ঘর ছেড়ে একতিল নড়তে চায় না। আমাদের সময়েও অতিথিশালা ছিল, কিন্তু অতিথির এত বেশি আদর ছিল না। তখন একটা দস্তুর ছিল, স্বামীদেরও যত্ন করতে হত। বেচারা ঠাকুরপো একাল ঘেঁষে জন্মেছে বলেই ফাঁকিতে পড়ে গেছে। ওর উচিত ছিল অতিথি হয়ে এ বাড়িতে আসা, তাহলে কিছু কাল টিঁকতে পারতো।"[১৭]

বিমলা তার আত্মকথায় জানিয়েছে যে সে তখন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সন্দীপের সম্মোহনী টানে যে সে তার প্রতি ধেয়ে চলেছে, সে নিজেও তা ভালো করে বুঝতে পারেনি। সে তার জায়ের কথা অবহেলায় উড়িয়ে দিয়েছে, কারণ তখনও বিমলার নিজেকে চিনতে বাকি ছিল, বাকি ছিল নিজের কামনাকে সঠিকভাবে বুঝতে। সে তখনো ভেবেছে সে স্বদেশ হিতৈষিতার ব্রত নিয়েছে। সে দেশের জন্য সন্দীপের কর্মযজ্ঞে প্রাণ দিতে চলেছে, তার লজ্জা শরমের দরকার নেই। এই ভাবের আব্রু যখন ঘুচে গেল, যখন দেশের কথার জায়গায় সন্দীপ নারী পুরুষের সম্বন্ধ ও অন্য হাজার কথা আমদানি করতে লাগলো - যাতে মোটা তারের একটাই কামনার সুর বাজছে তখন বিমলা বুঝেছে যে তাদের সম্বন্ধের আড়ালটুকুও আর রইল না। নিখিলেশের মধ্যে এতদিন যা পায়নি বিমলা, সন্দীপের মধ্যে সেই প্রবলের সুর, পৌরুষের সুর আবিষ্কার করে মুগ্ধও হয়েছে। বিমলা প্রতিজ্ঞা করেছে সে আর বাইরের ঘরে যাবে না, মরে গেলেও যাবে না, কিন্তু তখন তার নিজের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। বাইরের ঘরে না গিয়ে মনে হয়েছে জীবনের স্বাদ চলে গেছে। সে বুঝেছে তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কার জন্য যেন অপেক্ষা করে আছে। পরিচয়ের গোড়ায় সন্দীপকে বিমলা ভক্তি করত কিন্তু পরে শ্রদ্ধার বদলে অশ্রদ্ধাই করেছে, বুঝেছে নিখিলেশের চরিত্রের সঙ্গে সন্দীপের কোন তুলনাই হয় না। বুঝেছে সন্দীপের যে জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা তার চাঞ্চল্য মাত্র, কিন্তু বিমলা তখন এতদূর এগিয়ে গেছে যে তখন তার নিজের কাছে ফেরার পথটাও বন্ধ হয়ে গেছে। বহু নারীতে আসক্ত সন্দীপ তার অভ্যস্ত চোখে বিমলার এই পরিবর্তন লক্ষ করেছে। বুঝেছে বিমলার রাশি রাশি ঘষা চুলের মাঝে এই এতটুকু লাল ফিতের বাঁধন - সে যেন কালবৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা। আবার এও বুঝেছে এই কামনার ঝড় যে নিজের মধ্যে উঠেছে বিমলা নিজেও তা সম্পূর্ণ টের পায়নি। অনেকটাই তার নিজেরই অগোচরে বিমলা এগিয়ে চলেছে প্রলয়ের দিকে। সন্দীপ অভিজ্ঞ। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে তার আত্মকথায় আমরা পেয়েছি বিমলাই সন্দীপের প্রথম শিকার নয়, বিধবা কুসুম, আর এক ফিরিঙ্গি মেয়ে তারাও সন্দীপের সম্মোহনী জালে ধরা পড়েছিল। স্বদেশীর বুলি নিয়ে যে মেকি আদর্শবাদের জাল সন্দীপ বিছিয়েছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েরা তাতে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ঘরে- বাইরে* উপন্যাসে দেখিয়েছেন স্বদেশীর সর্বনাশের দিকটাও, বিশ্বাস করে নারীদের ঠকে যাবার প্রসঙ্গ।

> "নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা।"[১৮]

- মহুয়া কাব্য গ্রন্থের 'সবলা' কবিতায় যেমন ভাগ্য জয়ের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, তেমনই ঘরের চার দেয়ালের বাইরে বেরিয়ে ভাগ্য জয় করতে গিয়ে আশাহত হবার কাহিনী রয়েছে *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 216-225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারী মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, নারীর অন্তর্লোকের যথার্থ উন্মোচন পাই *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে। মেয়েদের সম্পর্কে এই উপন্যাসে কিছু যথার্থ উপলব্ধির কথা প্রকাশ পেয়েছে। বিমলা উপলব্ধি করেছে মেয়েরা সংসারে বিশ্বাসের উপরেই বাস করে। নিখিলেশের আত্মকথাতে উপমা ব্যবহার প্রসঙ্গে উঠে এসেছে মেয়েদের সম্পর্কে আর এক সত্য অনুভব –

> "বউ হয়ে যে মার খায় শাশুড়ি হয়ে সেই সবচেয়ে বড় মার মারে।"[১৯]

এই উপন্যাসে পাই নিখিলেশের মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ বাবু পঞ্চুর হঠাৎ আমদানি হওয়া মামীর হাতে খাওয়ায় চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতি পঞ্চুর ভক্তি শ্রদ্ধা কমে গেছে। আমাদের বাঙালি সমাজে বহু বর্ণে বিভক্ত ব্যবস্থায় নারীদের নানাভাবে অপমান করা হয়েছে। কখনো তাদের নামে দোষ দেওয়া হয়েছে - সেই দোষ লাগা নারীদের জলের কলসি ছুঁতে মানা ছিল, ঘরে ঢুকতে মানা ছিল। তাদের রাঁধা ভাতও কেউ খেত না। চন্দ্রনাথ বাবু পঞ্চুর মামীর হাতের রান্না খাওয়ায়, সে তাকে যত্নের একশেষ করেছে। আসলে মানুষ চায় স্বীকৃতি। পঞ্চু এই মহিলাকে সংসারের একধারে সরিয়ে রেখেছিল, আর চন্দ্রনাথ বাবু তার হাতের রান্না খেয়ে প্রশংসা করেছেন, এতেই মেয়েটি গলে গেছে।

বিমলা প্রকৃতই নিখিলেশকে ভালোবাসতো, সে ভালোবাসায় মিশে ছিল পূজা, তারপর সন্দীপের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তা সাময়িক মোহমাত্র, সামান্য সময়ের আত্মবিস্মৃতি। কলকাতা যাওয়ার প্রস্তুতির মুখে নিখিলেশ রাতে দেখে বিমলা মাটির উপরে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ভানুসিংহ রূপী রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'[২০] পদে যে জীবন সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, নিখিলেশ বিপদের মুখে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে যেতে বিমলা যেন সেই জীবনসত্যকেই অনুভব করে – 'জীবনবল্লভ মরণ-অধিক সো,'[২১] এই জীবনবল্লভের কাছে আশ্রয় চাওয়াই তো উপন্যাসের শুরু ও শেষের একমাত্র চাওয়া। অশোককুমার মিশ্র উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে বলেছেন,

> "বিমলা চরিত্রে সতীত্বের উজ্জ্বল আভা এবং আধুনিকতার অগ্নি দীপ্তি উভয়ের মিশ্রণ ঘটেছে।"[২২]

কেবলমাত্র উপন্যাসে ফুটে ওঠা নারীর অবস্থানই যে জানা যায় *ঘরে-বাইরে* পড়লে তা নয়, ঘরে বাইরের সমালোচনা সূত্রে সেযুগে বাংলায় যে ঝড় উঠেছিল তা থেকে বুঝে নেয়া যায় বাংলার তৎকালীন সমাজ জীবনে নারীর অবস্থান কেমন ছিল? সন্দীপের মুখে সীতার সতীত্ব প্রসঙ্গে কিছু কথা ঝড় তুলেছিল সে যুগের নরনারীর মনে। সীতার সম্পর্কে এমন কথা কি বলা যায়? প্রশ্ন তুলেছিলেন রবীন্দ্র সমসাময়িক অনেকেই। নারী হলেই তাকে সতীত্বের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকতে হবে এবং সতী নারীদের সম্পর্কে কোনোরকম প্রথা বহির্ভূত উক্তি করা যাবে না। গল্পের নেতিবাচক চরিত্রের মুখেও মহাকাব্যিক নারীর বিষয়ে তথাকথিত আপত্তিজনক কথা শুনতে সমাজ প্রস্তুত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "জানি আমাকে প্রশ্ন করা হইবে, সন্দীপ যত বড় মন্দ লোকই হউক তাহাকে দিয়া সীতাকে অপমান কেন? আমি কৈফিয়ত স্বরূপে বাল্মীকির দোহাই মানিব। তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন?"[২৩]

রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে আরও বললেন,

> "সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপেরই যোগ্য; অতএব সে কথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সংগত হইয়াছে। এবং সেই সংগতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।"[২৪]

শুধু সীতা প্রসঙ্গে নয় সমসাময়িক যুগে *ঘরে-বাইরে* নিয়ে আপত্তি উঠেছিল নরনারীর সম্পর্ককে মেলে ধরায়। অর্চনা মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা' গ্রন্থে 'ঘরে-বাইরে ও তার মূল বৈশিষ্ট্য' পরিচ্ছেদে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "ঘরে-বাইরে উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে নরনারীর হৃদয় রহস্য উদঘাটন করেছেন এবং বিবাহিতা হিন্দু মেয়ের মন বিশ্লেষণ করেছেন, তা সেকালে সমগ্র দেশে ভীষণ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। সমাজে এমনকি সাহিত্যিকদের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল।"[২৫]

জমিদার বাড়ির অর্থবান মহিলা নয়, অতি সাধারণ এক নারীর কথাও উঠে এসেছে *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে। সে নিখিলেশের পিসতুত বোন মুনু। তাদের মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইতে মুনুর স্বামী গোপাল এসেছিল নিখিলেশের কাছে। গোপাল মদ খেতো। মদ খেয়ে মুনুকে ধরে মারত, তারপর অনুতাপে হাউ হাউ করে কাঁদত। শপথ করে বলতো আর কখনো মদ ছোঁবে না। পর দিন সন্ধ্যাবেলাতেই কিন্তু আবার মদ নিয়ে বসত। জমিদার বাড়ির বউ হিসেবে মদের

সর্বনাশা নেশায় বিমলার বড়জা মেজ জাকেই শুধু সিঁথির সিঁদুর খোওয়াতে হয়নি। মদের নেশা কীভাবে সমাজের উঁচু থেকে নিচু সর্বস্তরে ছড়িয়ে ছিল, আর কীভাবে তা নারীদের সংসার জীবনকে বিপর্যস্ত করছিল তার আলেখ্যও রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন তাঁর *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে। এই এত সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিখিলেশের বোন মুনু তার লক্ষ্মীর হাতে তার গরিবের সংসারকে অমৃতে ভরিয়ে তুলেছিল।

বিমলার মেজ জা ন'বছর বয়সে নিখিলেশদের বাড়ির বধূ হয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে আর একটি দিনের জন্যও বাড়ির বাইরে কাটাননি। বয়সে তিন বছরের ছোট দেওরের সঙ্গে পথ্য-অপথ্য ভাগ করে খেয়েছেন, একত্রে খেলেধুলে বড় হয়েছেন। স্বামীকে হারাবার পর থেকে তাঁর একটিমাত্র আন্তরিক সম্বন্ধ সে শুধুমাত্র তাঁর দেওরের সঙ্গে। সেখানে বৈষয়িক বিষয় নিয়ে ঝগড়া এসেছে, সংসারের নানান খুঁটিনাটি নিয়ে ঝামেলা হয়েছে, কিন্তু নিখিলেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কেবলমাত্র সামাজিকতার সম্পর্ক নয়, তার থেকেও গভীর প্রাণের টানের সম্পর্ক বলেই সে সম্পর্ক ভাঙেনি। তাই উপন্যাসের শেষে নিখিলেশ, বিমলা কলকাতা যাবে ঠিক করায় তিনিও তাঁর তোরঙ্গ গুছিয়ে নেন। চিরদিনের অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়তে চান শুধুমাত্র দেওরের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্বন্ধটুকুকে সম্বল করে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকবেন বলে। মেয়ে জন্মের উপর তাঁর ধিক্কার এসে গেছে। যা তিনি জীবনে সয়েছেন তা কেবল একটা জন্মের উপর দিয়েই যাক এই তাঁর বাসনা।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসে স্বাদেশিকতার ব্রত নিয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাওয়া দিয়ে মেয়েদের যে বাইরে বেরোনোর শুরু হয়েছে তা উপন্যাসের শেষে আবার অন্দরমহলেই ফিরে গেছে, উৎকণ্ঠিত আগ্রহে চেয়ে থেকেছে স্বামীর ফিরে আসার পথের দিকে। অশোককুমার মিশ্র তাঁর 'উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন,

> "বিমলা চরিত্রটি 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের একটি আইডিয়ার বাহনও সে। ঘর-বার দ্বন্দ্বে প্রত্যক্ষ ভোক্তা সে। বিমলা ঘটনার নিয়ন্তা নয়, বরং ঘটনার স্রোতে ভেসে গেছে সে।"[২৬]

বিমলা ও বিমলার সূত্র ধরে অন্য যেসব নারীর কথা এ উপন্যাসে ফুটে উঠল তাঁরাও ঘরে বাইরে নানা সমস্যায় জর্জরিত হতে হতে বেঁচে থাকার মূল সুরটিকে জীবনে সুরক্ষিত রেখেছেন।

Reference :

১. চৌধুরী, ভূদেব, রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ৬৬
২. বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, পথের পাঁচালী, প্রথম পর্বনাম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মাঘ, ১৪০২, কলকাতা, পৃ. ৩
৩. চৌধুরী, ভূদেব, রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ৭২
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঘরে-বাইরে, বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৫
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৫
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৩৪
৭. চৌধুরী, ভূদেব, রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ৬৬
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৬
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১৫-১৬
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, কলকাতা, পৃ. ৩৭৮

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২২
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৩১
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৩৪
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ১৫৭
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২২
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৭১
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৬৮-৬৯
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সবলা, মহুয়া (২৮) বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ১৯২৯, কলকাতা।
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ঘরে-বাইরে,* বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৩১
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভানুসিংহের পদাবলী(১৯), বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৪, কলকাতা।
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভানুসিংহের পদাবলী (১৯), বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৪, কলকাতা।
২২. মিশ্র, অশোককুমার, উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, জুন, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৩১
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য বিচার, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৬, (পরিশিষ্ট ঘরে বাইরে), বিশ্বভারতী, মার্চ ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২২০
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য বিচার, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৬, (পরিশিষ্ট–ঘরে বাইরে), বিশ্বভারতী, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২২০
২৫. মজুমদার, অর্চনা, রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ১৩১
২৬. মিশ্র, অশোককুমার, উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, জুন, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৩১